২৯ মার্চ পাবনার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানিদের বড় খেসারত

মো. রেজুয়ান খান

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট মূলতঃ পাবনাবাসীকে আতঙ্কিত করেনি, বরং পুরো পাকিস্তানি আগ্রাসী সেনাদের করেছিল হতবিহ্বল। ইয়াহিয়ার পাকিস্তানি আগ্রাসী সেনাদের ধারণাই ছিল না, নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালি প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধ হলে কতটা ভয়ংকর হতে পারে। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় ছিল চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনা এই তিনটি জেলা। ২৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পাবনার সাধারণ মানুষ আর নেতাকর্মীদের প্রতিরোধ আক্রমণে অর্ধশতাধিক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছিল। যা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য বড় ধরনের এক খেসারত।

২৫ মার্চ আগ্রাসী পাকিস্তানি সৈন্য দল পাবনা শহর থেকে চার মাইল দুরে হেমায়েতপুরে ঘাঁটি গাড়ে। সেখান থেকে পাক সেনারা পাবনা শহরের ট্রেজারি অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস দখল করে নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা শহর ঘিরে ফেলে। শহরময় মাইকে কার্ফু জারির ঘোষণা প্রচার করা এবং সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল, বাইরে কেউ বেরুলে গুলি করা হবে বলে প্রচারণা চালাচ্ছিল। সেদিনই পাবনা শহরের আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য তৎকালীন এমএলএ এডভোকেট আমিন উদ্দিন, ভাসানী ন্যাপের জেলা সভাপতি ডাঃ অমলেন্দু দাক্ষী, তৃপ্তি নীলয় হোটেলের মালিক সাঈদ তালুকদারসহ গোটা পঞ্চাশেক মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। পরে ঐসব নেতাদের তারা গুলি করে হত্যা করেছিল। ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাসন দেশব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। ৭ মার্চের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশের প্রত্যেক পাড়ায়, মহল্লায় দুর্গ গড়ে তোলার জন্য আপামর জনতা সেদিন এক হয়েছিল। পাকিস্তানি আগ্রাসন প্রতিরোধে পাবনার তদানিন্তন সাহসী জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খান, পাবনার পুলিশ সুপার আবদুল গাফফার ও স্থানীয় নেতাকর্মীসহ বিশাল মুক্তিকামী মানুষ দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালিদের উপর অতর্কিত হামলা চালাতে পারে সে আশঙ্কা অনেকের মনে সেইসময়ে উদয় হয়েছিল। পাবনা জেলা প্রশাসক দেশপ্রেমিক নূরুল কাদের খান ও পুলিশ সুপার আবদুল গাফফার মনস্থির করেছিলেন, পাবনা শহর শত্রç সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। সেদিন প্রায় শতাধিক পুলিশ সদস্যও পাকিস্তানি আগ্রাসি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে মনেপ্রাণে প্রস্তুত ছিলেন। এদিকে পাবনার আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা আমজাদ সাহেব পাকিস্তানি মিলিটারিদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পাবনার গ্রামে গ্রামে কৃষক মজুরদেরকে সংঘঠিত করার কাজে লেগে পড়েন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাসন আর পাবনার আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ সাহেবের অনুপ্রেরণায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাবনা শহরের আশেপাশের গ্রামবাসীরা দেশীয় অস্ত্র, হাতিয়ার নিয়ে পাকিস্তানি শাসক শত্রçদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকল।

২৭ মার্চ পাক সৈন্যরা পাবনা পুলিশ ব্যারাকে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে অস্ত্রাগার তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বাঙালি পুলিশদের নির্দেশ দেয়। বাঙালি পুলিশ বাহিনী এতে অসমর্থ জানায়। পুলিশের সদস্যরা পাক সৈন্যদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন তাদের অস্ত্রাগার কারো হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য পাবনার ডিসি সাহেবের নির্দেশ রয়েছে। সেখানে প্রথমে বাকবিতণ্ডা, পরে গুলি বিনিময়। এ যুদ্ধে চারজন পাক সেনা নিহত হয়। পরে পাক সেনারা পিছু হটে যায়। দিনের বেলায় পুলিশ ব্যারাক দখল করতে না পারায়, রাতের বেলায় তারা যে আবার হামলা করতে পারে তা বাঙালি পুলিশরা সেইদিন অনুধাবন করেছিলেন। তাই রাতে পুলিশ ব্যারাক আবার হামলা হওয়ার আশঙ্কায় বাঙালি পুলিশরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ব্যারাকের আশে পাশে বাড়ির ছাদ, পথের মোড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আড়ালে থেকে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে ওত পেতে থাকে। সেদিন পুলিশ ব্যারাকের সদস্যদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন জেলখানার পুলিশ সদস্যবৃন্দ। এভাবে সারা রাত তারা শত্রçর জন্য মৃত্যুফাঁদ সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। রাত সাড়ে চারটার সময় পাকিস্তানি সেনারা চুপিসারে পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের আগমন উপলব্ধি করে বাঙালি পুলিশ সদস্যরা প্রথম আক্রমণ করে বসল। দুপক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি ও সংঘর্ষ বেঁধে গেল। অতর্কিত এ ধরনের প্রতিরোধ ঘটবে তা পাক সেনারা সেদিন বুঝতে পারেনি। এমন প্রতিরোধে ইয়াহিয়ার সুশিক্ষিত পাক সেনারা হতভম্ব হয়ে গেল। এই সংঘর্ষে ঐদিনই ২১ জন পাক সেনা নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ঐদিন বাঙালি পুলিশদের মধ্যে একজনও শহীদ হননি। সাবাস! পাবনার পুলিশ ভাইয়েরা।

২৮ মার্চ, ২৭ জন সৈন্য পাবনা শহরের টেলিফোন একচেঞ্জ দখল করে রেখেছিল। এদিকে পাকিস্তানি হামলাকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ পাবনা শহরের আশে পাশের গ্রামবাসীসহ তরুণ-যুবকদের উজ্জীবিত ও

ঐক্যবদ্ধ করছিলেন। গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, জনতা চারদিক থেকে লাঠিসোটা, বর্শা-বল্লম, তীর-ধনুক নিয়ে পাকসেনাসহ টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি ঘিরে ফেলল। ক্রমান্বয়ে ১০ থেকে পনের হাজার জনতা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের গগনবিদারী শরগোল পাকসেনাদের সেদিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভিতর থেকে বাঙালিদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে লাগল। ওদের ভারী মেশিনগানের গোলাগুলির কারণে বাঙালিরা সেদিন পাকসেনাদের খতম করতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে বাঙালি জনতার পরিকল্পনা ছিল, ওখানে আটকা পড়া শত্রুদের খাদ্যের মজুদ শেষ হলে তাদের ঘায়েল করা সহজ হবে। ২৮ মার্চ সারা রাত তারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ঘেরাওরত অবস্থায় আটক ছিল।

২৯ মার্চ আটকে পড়া শত্রু সেনাদের কাছ থেকে ওয়ার্লেস টেলিফোনে বার্তা পেয়ে পাক সেনারা যুদ্ধ বিমান নিয়ে তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। আকাশে যুদ্ধ বিমান থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। বাঙালিরা এর আগে কোনো দিন স্বচক্ষে যুদ্ধ জেট বিমান দেখেনি। গোলাগুলির তীব্র শব্দে অসহায় বাঙালিরা এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। এ সুযোগে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আটকে পড়া পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রাণভয়ে এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। এরই মধ্যে পাবনায় আটকে পড়া সৈন্যদের রক্ষা করতে রাজশাহী থেকে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী ট্যাংক, কামান ও ভারী অস্ত্রসস্ত্রসহ শতাধিক পাক সেনার বহর সেখানে এসে পৌঁছায়। একদিকে জড়ো হওয়া জনতাকে ভয় দেখাতে ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাকিস্তানি জেট বিমান উপর থেকে ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসা আবার উপরে ওঠে যাওয়া, আর গোলাগুলির হামলার মধ্যেও বাঙালি জনতারা পাকিস্তানি সেনাদের ধাওয়া করে। ঐসময় তেরো জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়েছিল। ২৯ মার্চ ১৯৭১ সালে সেদিন পাক সেনাদের গুলিতে ৪০ জন বাঙালি শহীদ হয়েছিলেন।

৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে ঘোষিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করার জন্য তরুণ যুবক, বিভিন্ন পেশার মানুষ গোপনে দেশব্যাপী অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাবনার ঈশ্বরদীর কৃষক, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতাসহ বিভিন্ন জনের কাছে থাকা দেশীয় একনলা ও দুনলা ৪২টি বন্দুক সংগ্রহ করে রেখেছিল। এদিকে পাক সেনাদের কীভাবে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় সে বিষয়ে ডিলু বাহিনী (সাবেক ভূমি মন্ত্রী মরহুম শামসুর রহমান শরীফ) ঈশ্বরদী পাকশি রেলওয়ে মাঠে বসে পরিকল্পনা করছিল। সেইসময়ের ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান রাজু, হাশেম মল্লিক, আবদুর রাজ্জাক এরা ডিলু বাহিনীর সদস্য ছিল। এরই মধ্যে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক পাবনা আক্রমণ ও সেনাদের আটক করার খবর তাদের কাছে পৌঁছে যায়। বিলম্ব না করে তারা তখনি পাকসী রেলওয়ে মাঠ থেকে পাবনা শহরের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনাদলের কনভয়টি পাবনা থেকে হতাহত সৈন্যদের রিকভারি করে ঈশ্বরদীর দাপুনিয়া মাধপুর হয়ে রাজশাহীর দিকে ফিরে যাচ্ছে।

শামসুর রহমান শরীফ ডিলু বাহিনী পাক সৈন্যদের ধরাশায়ী করার মতো এমন সুযোগকে সেদিন হাতছাড়া করতে চাননি। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল দাপুনিয়ার মাধপুরে পাক সেনাদের পথ আটকে দিয়ে তাদেরকে খতম করার। মাধপুরের একটি প্রকান্ড বট গাছের আড়ালে থেকে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করার মতো উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে। সেখানে ডিলু বাহিনী ট্রেন্স খনন করা শুরু করে। ডিলু বাহিনীর সংগৃহীত ৪২টি অস্ত্র, পাবনা থানা থেকে পাওয়া আরও ৭টি আধুনিক অস্ত্র, হাতের তৈরি বোমা, তীর, ধনুক, বল্লম, হাসুয়া বাঁশ নিয়ে হাজার হাজার জনতা আগ্রাসি পাকিস্তানি মিলিটারি সেনাদের উপর সেদিন ঝাপিয়ে পড়েছিল। ডিলু বাহিনীর আক্রমণে সেদিন মাধপুরে পাকিস্তানি সেনা মেজর আসলামসহ এক ডজন পাক আর্মি নিহত হয়। পাকিস্তানি আর্মির এ বহরের কাহারো রাজশাহী যাওয়ার রাস্তা চেনা না থাকায়, মাধপুরের হামলায় তাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ আসায় তারা তাদের সাজোয়া যুদ্ধ যান ফেলে রেখে যে যেভাবে পারে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মি বহরের প্রায় শতাধিক সৈন্যের সব সৈন্য রাজশাহী পৌঁছার আগেই বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণে মারা যায়। সেদিনের সেই স্মৃতি ভুলার নয়। সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ঈশ্বরদীর তৎকালীন ছাত্র নেতা রাজু, হাশেম মল্লিক, আবদুর রাজ্জাক, ওহিদুর রহমান, আব্দুল গফুর, নূরুল ইসলাম, আলী আহম্মদ, নবাব আলী, হামির উদ্দিন ও ফরমান সরদারসহ ১৭জন মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়া প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন প্রায় অর্ধশতাধিক নিরীহ গ্রামবাসী। পাকিস্তানি বাহিনীর এলোপাতারি গুলিতে এসকল বীর যোদ্ধারা সেদিন নিহত হয়েছিলেন। পাবনার প্রথম প্রতিরোধমূলক জনযুদ্ধে পাকিস্তানি ২ শতাধিক সৈন্য নিহত হয়েছিল।

প্রতিবছর ২৯ মার্চ মাধপুরে শহীদদের স্মরণে বিশেষ দিবস পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের মুক্তি সংগ্রামের ডাকই সকলকে মুক্তিকামী করেছিল, উজ্জীবিত করেছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে পাক আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো, মুক্তিযোদ্ধারা সুসংগঠিত হলো, তবুও মাধপুরের ২৯ মার্চের সেইদিনের অদম্য বিশাল আত্মত্যাগ জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। পাবনার প্রথম স্বার্থক সম্মুখ মুক্তিযুদ্ধ ছিল এটি। ২৯ মাচ থেকে ১১ এপ্রিল ১৯৭১ পযন্ত পাবনা জেলা শত্রু মুক্ত ছিল।

#

লেখক- তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।

২৮.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার